দ্বাদশ ইমাম

একাদশ ইমামের পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হাসান আল্ মাহ্দী হলেন দ্বাদশ ইমাম। তিনি মাহ্দী মাওউদ, ইমামুল আস্র্ এবং সাহেবুজ্জামান নামে পরিচিত। হিজরী ২৫৫ অথবা ২৫৬ সনে ইরাকের 'সামেরা' শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার শাহাদতের (২৬০ হিঃ) পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরাসরি পিতার তত্ত্বাবধানেই লালিত পালিত হন। অবশ্য ঐসময় তাঁকে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসবাস করতে হয়। শুধুমাত্র ইমামের অনুসারী অল্প ক'জন বিশিষ্ট শীয়া ব্যতীত তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আর কারও ঘটেনি। পিতার (একাদশ ইমাম) শাহাদত প্রাপ্তির পর তিনি ইমামতের পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তার পরপরই মহান আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন। দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিবর্গ ছাড়া আর কারো নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি।[১]

বিশেষ প্রতিনিধি

দ্বাদশ ইমাম হযরত মাহ্দী (আ.) আত্মগোপন করার পর জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীকে (রহঃ) নিজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি ইমামের দাদা (দশম ইমাম) ও বাবার (একাদশ ইমাম) বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত। জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মাধ্যমেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) শীয়া জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মৃত্যুর পর তারই পুত্র মুহাম্মদ বিন ওসমান ইমাম মাহ্দী (আ.) এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। জনাব মুহাম্মদ বিন ওসমান ওমারীর মৃত্যুর পর জনাব আবুল কাসিম হুসাইন বিন রূহ্ আন্ নওবাখতি (রহঃ) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। তার মৃত্যুর পর জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) হিজরী ৩২৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর অল্প ক'দিন পূর্বে ইমামের স্বাক্ষরসহ একটি নির্দেশ নামা জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরীর হাতে পৌঁছে। ঐ নির্দেশ লিপিতে ইমাম মাহদী (আ.) তাকে বলেন যে, আর মাত্র ছয় দিন পরই তুমি এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিবে। তার পরপরই বিশেষ প্রতিনিধিত্বের যুগের অবসান ঘটবে এবং দীর্ঘকালীন অর্ন্তধানের যুগ শুরু হবে। মহান আল্লাহ্র পক্ষ

---

[১]। 'বিহারুল আনোয়ার' ৫১ নং খন্ড, ৩৪২ ও ৩৪৩ থেকে ৩৬৬ নং পৃষ্ঠা। 'কিতাবুল গাইবাহ শেইখ মুহামাদ বিন হাসান তুসী -দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২১৪ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা। 'ইসবাতুল হুদাহ্' ৬ষ্ঠ ও ৭ম খন্ড, দ্রষ্টব্য।

থেকে ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশের নির্দেশনা আসা পর্যন্ত ঐ দীর্ঘ কালীন অর্ন্তধানের যুগ অব্যাহত থাকবে।[২] ইমামের হস্তলিপি সম্পন্ন ঐ পত্রের বক্তব্য অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.)-এর অর্ন্তধানকালীন জীবনকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম ঃ স্বল্পকালীন অর্ন্তধান। হিজরী ২৫০ সনে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং হিজরী ৩২৯ সন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত এই অন্তর্ধান স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় ঃ দীর্ঘকালীন অর্ন্তধান। হিজরী ৩২৯ সন থেকে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং মহান আল্লাহ্র ইচ্ছামত এই অর্ন্তধান অব্যাহত থাকবে। মহানবী (সা.)-এর একটি সর্বসম্মত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহ্দী (আ.) আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"[৩]

সাধারণ দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আ.) এর আর্বিভাব

ইতিপূর্বে আমরা নবুয়ত ও ইমামতের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, গণহেদায়েতের নীতি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে বলবৎ রয়েছে। সেই নীতির, অপরিহার্য ফলাফল স্বরূপ মানবজাতি 'ওহী' ও 'নবুয়তের' শক্তি সরঞ্জামে সুসজ্জিত। ঐ বিশেষ শক্তিই মানব জাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐ বিশেষ শক্তি যদি সামাজিক জীবন যাপনকারী মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করতেই না পারে, তাহলে ঐ বিশেষ শক্তির সরঞ্জামে মানবজাতিকে সুসজ্জিত করার মূলকাজটিই বৃথা বলে প্রমাণিত হবে। অথচ, এ সৃষ্টিজগতে বৃথা বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অন্যকথায় বলতে গেলে, মানব জাতি যেদিন থেকে এ জগতে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে সৌভাগ্যপূর্ণ (সার্বিক অর্থে) এক সামাজিক জীবন যাপনের আকাংখা তার হৃদয়ে লালন করে আসছে। আর সেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যেই সে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার হৃদয়ে ঐ আকাংখা সত্যিই যদি অবাস্তব হত, তাহলে নিশ্চয়ই সে ঐ আকাংখার স্বপ্নিল ছবি তার হৃদয় পটে আঁকতো না। অথচ, আবহমানকাল থেকে জগতের প্রতিটি মানুষই তার জীবনে এমন একটি আকাংখা হৃদয় কুঠুরীতে লালন

---

[২]। বিহারুল আনোয়ার' ৫১ নং খন্ড, ৩৬০ থেকে ৩৬১ নং পৃষ্ঠা। 'কিতাবুল গাইবাহ্' -শেইখ মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী' ২৪২ নং পৃষ্ঠা।

[৩]। নমুনা স্বরূপ একটি হাদীসের উদ্ধৃতী এখানে দেয়া হলঃ "এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহ্দী (আ.) আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (-ফুসুলুল্ মুহিম্মাহ্' ২৭১ নং পৃষ্ঠা।)

করে আসছে। যদি খাদ্যের অস্তিত্ব না থাকত তা হলে ক্ষুধার অস্তিত্ব থাকত না। পানির অস্তিত্বই যদি না থাকবে, তাহলে কিভাবে তৃষ্ণার অস্তিত্ব থাকতে পারে? যৌনাংগের অস্তিত্বই যদি না থাকত তা হলে যৌন কামনার অস্তিত্বও থাকত না। এ কারণেই বিশ্ব জগতে এমন এক দিনের আর্বিভাব ঘটবে, যখন মানব সমাজ সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার ভোগ করবে। সমগ্র বিশ্বে তখন শান্তি নেমে আসবে। সবাই শান্তি পূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে। তখন মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের মাঝে নিমিজ্জিত হবে। অবশ্য ঐধরণের পরিবেশ টিকিয়ে রাখার ব্যাপরটি তখন মানুষের উপরই নির্ভরশীল হবে। ঐধরণের সমাজের নেতৃত্ব দান করবে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা; হাদীসের ভাষায় যার নাম হবে মাহ্দী (আ.)। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মেই বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এবং সাধারণভাবে তাঁর আর্বিভাবের সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে। যদিও ঐ ব ক্তব্যের বাস্তব প্রয়োগে কমবেশী মতভেদ রয়েছে। সর্বসম্মত হাদীসে মহানবী (সা.) হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে বলেছেনঃ "প্রতিশ্রুত মাহদী আমারই সন্তান"।

বিশেষ দৃষ্টিকোণে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আর্বিভাব

মহানবী (সা.) ও পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের পক্ষ থেকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজকে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন দান করবে।[৪] অসংখ্য হাদীসের সাক্ষ্য অনুযায়ী একাদশ ইমাম হযরত হাসান আসকারীর (আ.) সন্তানই ইমাম মাহদী (আ.)।[৫] হাদীস সমূহের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্মের পরে সুর্দীঘকালের জন্যে তিনি অদৃশ্যে অবস্থান করবেন। তারপর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ বিশ্বে সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

---

[৪] । উদাহরণ স্বরূপ দু'টি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল, "হযরত ইমাম বাকের (আ.) বলেছেনঃ "যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে, তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ঐশীশক্তিতে সমস্ত বান্দাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে পূর্ণত্ব দান করবেন। (-'বিহারূল আনোয়ার' ৫২তম খন্ড, ৩২৮ ও ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।) "আবু আব্দুল্লাহ্ (আ.) বলেনঃ সমস্ত বিদ্যা ২৭টি অক্ষরের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর আনীত জনগণের উদ্দেশ্যে সমস্ত বিদ্যার পরিমাণ মাত্র দুটি অক্ষর সমান। মানবজাতি আজও ঐ দুটি অক্ষর পরিমাণ জ্ঞানের অধিকের সাথে পরিচিত হয়নি। তবে যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে তখন আরও ২৫টি অক্ষরের বিদ্যা জনসমাজে প্রকাশ ঘটাবেন। একইসাথে পূর্বের ঐ দুটি অক্ষরের বিদ্যাও তিনি সংযুক্ত করবেন, ফলে জ্ঞান ২৭টি অক্ষরে পরিপূর্ণ হবে। (-বিহারূল আনোয়ার, ৫২তম খন্ড ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।)

[৫] । উদাহরণ স্বরূপ আরো একটি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল ঃ "জনাব সিক্কিন বিন আবি দালাফ বলেনঃ "আমি হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন রেজা (আ.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ "আমার পরবর্তী ইমাম হবে আমারই পুত্র হাদী। তাঁর আদেশ ও বক্তব্য সমূহ আমারই আদেশ ও বক্তেব্যের সমতুল্য আর তাঁর আনুগত্য আমাকে আনুগত্য করার শামিল। হাদীর পরবর্তী ইমাম হবে তাঁরই সন্তান হাসান আসকারী। যার আদেশ ও বক্তব্য সমূহ তাঁর পিতারই আদেশ ও বক্তব্য ও আদেশসম। একইভাবে তাঁর আনুগত্য তাঁর বাবারই আনুগত্যর শামিল। (অতঃপর ইমাম যাওয়াদ (আ.) নীরব থাকলেন) -তাঁকে বলা হল ঃ হে রাসুলের সন্তান ! হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম কে হবেন? (ইমাম যাওয়াদ) প্রচন্ড কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন ঃ হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম তাঁরই সন্তান কায়েম (মাহ্দী) সত্যের উপর অধিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুত। (-বিহারূল আনোয়ার' ৫১তম খন্ড, ১৫৮ নং পৃষ্ঠ।)

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন ঃ শীয়া বিদ্বেষী লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তিমূলক প্রশ্ন উপস্থাপন করে যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) শীয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ যাবৎ প্রায় ১২০০ বছর জীবন যাপন করেছেন। অথচ এযাবৎ পৃথিবীর কোন মানুষই এত দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পারে না।

উত্তর ঃ বাহ্যিকভাবে আপত্তিটি গ্রহণযোগ্য বটে। তবে আমরা যদি উক্ত বিষয় সংক্রান্ত মহানবী (সা.) ও ইমামগণের (আ.) হাদীসগুলো পড়ে দেখি, তা হলে অবশ্যই দেখতে পাব যে, সেখানে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ঐ দীর্ঘ জীবনকে অলৌকিক ও অসাধারণ একটি বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য অলৌকিক বিষয় এবং অসম্ভব বিষয় এক নয়। বরং দু'টোই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জ্ঞানগত দিক থেকে অলৌকিক বিষয়কে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ, এটা কারও পক্ষে আদৌ বলা সম্ভব নয় যে, শুধুমাত্র আমাদের দেখা এবং জানা কার্য-কারণ গুলোই এ বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল। আর এর বাইরে এ জগতে অন্য কোন কার্য-কারণই ক্রিয়াশীল নয়, যা সম্পর্কে আমাদের আদৌ কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই। অথবা যে সব কার্য-কারণ, কখনই আমরা দেখিনি, অনুধাবন করিনি তার কোন অস্তিত্বই এ জগতে থাকতে পারে না। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এক বা একাধিক মানুষের ক্ষেত্রে এ বিশ্ব জগতে এমন কোন কার্য কারণ ঘটতে পারে, যার ফলে তাদের আয়ু একাধিক হাজার বছর পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। আর এই সম্ভবনার অস্তিত্বের কারণেই আজ আমরা দেখতে পাই যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের দীর্ঘায়ু লাভ সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণায় আজও নিরাশ হয়নি। আর ঐশীগ্রন্থের অধিকারী এবং নবীদের অলৌকিক নির্দশনে বিশ্বাসী ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ ধরণের আপত্তিমূলক প্রশ্নের উপস্থাপন সত্যিই আশ্চার্যজনক।

প্রশ্ন ঃ শীয়া বিরোধীরা আপত্তি করে বলে যে, শীয়ারা তো দ্বীনি বিধান ও ইসলামের নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা ও জনগণের নেতৃত্ব প্রদানের জন্যেই ইমামের উপস্থিতিকে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইমামের অর্ন্তধানের বিষয়টি শীয়াদের বর্ণিত ঐ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ বলেই প্রমাণ করে। অর্ন্তধানের ফলে জনগণ যদি ইমামের নাগালই না পায়, তাহলে ঐ ইমামের অদৃশ্য অস্তিত্বই তো মূল্যহীন। মানবসমাজ সংস্কারের জন্যে যদি ইমামের অস্তিত্বের প্রয়োজন আল্লাহ্ কখনও

উপলব্ধি করেন, তা হলে ঐ মুহূর্তেই তাঁকে সৃষ্টি করার মত ক্ষমতাও আল্লাহ্‌র রয়েছে।

সুতরাং ইমামের আর্বিভাবের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত ইমামের আয়ু দীর্ঘায়িত করার কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই।

উত্তর ঃ উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপনকারী আসলে ইমামতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ইতিপূর্বে ইমামতের অধ্যায়ে আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের বাহ্যিক জ্ঞান ও বিধিবিধান বর্ণনা এবং জনগণের প্রকাশ্য নেতৃত্ব দানই ইমামের একমাত্র দায়িত্ব নয়। মানুষের বাহ্যিক পথনির্দেশনা যেমন ইমামের দায়িত্ব, তেমনি গোপন ও আধ্যাত্মিক কাজকর্মের নেতৃত্ব দানও তাঁরই দায়িত্ব। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে তো তিনিই বিন্যাস করেন এবং মানুষের কৃতকর্মের প্রকৃত স্বরূপকেও তিনিই আল্লাহ্‌র অভিমুখে পরিচালিত করেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ইমামের দৈহিক উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি এখানে আদৌ কার্যকর নয়। আধ্যাত্মিকভাবে সকল মানুষের হৃদয় ও আত্মার সাথে ইমামের সংযোগ বিদ্যমান এবং সবার আত্মার উপরই তিনি সম্যক দ্রষ্টা ও প্রভাবশালী। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি অদৃশ্য অবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁর দ্বারা মানবসমাজের সংস্কার ও তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় এখনও উপস্থিত হয়নি। তবুও তাঁর প্রতিনিয়ত অদৃশ্য উপস্থিতি মানবজাতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট ঃ শীয়াদের আধ্যাত্মিক আহ্‌বান

বিশ্ববাসীর প্রতি শীয়াদের বাণী শুধু এটাই যে, "আল্লাহ্‌কে জানুন।" অর্থাৎ জীবনে যদি সৌভাগ্য ও মুক্তি কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ্‌কে জানার পথ অবলম্বন করুন। আর এটা প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী (সা.)-এর হাদীসের অনুরূপ। বিশ্বনবী (সা.) যখন ইসলামের আর্ন্তজাতিক আহ্‌বানের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "হে জনগণ! এক আল্লাহ্‌কে জানতে চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্‌কে এক বলেই স্বীকার কর। কেননা এর মধ্যেই তোমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে।" এই অমিয় বাণীর ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে এটাই বলব মানুষ হিসেবে আমরা স্বভাবগতভাবে জীবনের বিভিন্ন পার্থিব লক্ষ্য ও কামনা বাসনার পুজারী। যেমন ঃ সুস্বাদু খাদ্য, পানীয়, সুন্দর পোষাক, আরামপ্রদ বাসস্থান, মনোরম দৃশ্য, সুন্দরী স্ত্রী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশাল ধনসম্পদ, প্রবলক্ষমতা, উচ্চতর রাজনৈতিক পদমর্যাদা, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব, আপন মনের সাধ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বাস্তবায়ন ও বিরোধীদের বিনাশই আমাদের প্রবৃত্তির চির আকাংখা। কিন্তু এর পাশাপাশি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিবেক অনুযায়ী আমরা সবাই এটা

উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের উপভোগ্য সবকিছু মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে ঐসবের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। স্বাভাবতই ঐ সমস্ত কিছু মানুষের পিছনে ছুটে আসবে। তাই মানুষকে ঐসবের পিছনে ধাবিত হওয়া উচিত নয়। উদরপূর্তি এবং যৌনতৃপ্তি ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া তো গরু ছাগলেরই বা পাশবিক জীবনার্দশ। অন্যদের হত্যা করা, ছিন্ন-ভিন্ন করা এবং অসহায় করাতো বাঘ, নেকড়ে, বা শিয়ালেরই নীতি। আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকপ্রসূত স্বভাবই মানুষের জীবনাদর্শ। বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞাজাত জীবন দর্শনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে। আমাদেরকে তা কখনোই কামরিপু চরিতার্থের পথে বা আত্মঅহমিকা অথবা স্বার্থপরতার পথে পরিচালিত করে না। বিবেক ও প্রজ্ঞা প্রসূত জীবন দর্শন মানুষকে এ সৃষ্টি জগতেরই একটি অংশ বিশেষ হিসেবে বিবেচনা করে। ঐ জীবন দর্শনের দৃষ্টিতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সার্বভৌম কোন অস্তিত্বের অধিকারী নয়। অথচ মানুষ সাধারণতঃ ধারণা করে যে, সে এই প্রকৃতি জগতের নিয়ন্ত্রক। তার ধারণা অনুযায়ী সে-ই এই অবাধ্য ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতিকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণের মাধমে তার কাছে নতজানু হতে বাধ্য করে। অথচ, প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার নিজের অজান্তেই এই প্রকৃতির হাতের পুতুল এবং তার নির্দেশ পালনকারী আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত জীবন দর্শন মানুষকে এই দ্রুত ধ্বংসশীল জগতের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধির ব্যাপারে অধিকতর সর্তকতা অবলম্বন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানায়। কেননা, এরফলে মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সৃষ্টিজগতের কিছুই নিজ থেকে অস্তিত্বশীল হয়নি। বরং তা এক অসীম উৎস থেকেই উৎসরিত। ঐজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে এটা মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আকাশ ও পৃথিবীর সব সুন্দর ও অসুন্দর অস্তিত্ব বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অন্য একটি বাস্তবতারই প্রতিফলন মাত্র। এটা ঐ মূল অস্তিত্বেরই বর্হিঃপ্রকাশ মাত্র, যার বর্হিঃপ্রকাশ কখনও নিজ থেকে নয়। অতীতের সকল ঘটনা, শক্তি ও মহিমা সবই আজ রূপকথার গল্প বৈ আর কিছুই নয়। তেমনি আজকের ঘটনাপ্রবাহও আগামীকালে রূপকথা বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ সবকিছুই তার নিজের কাছে রূপকথারই নামান্তর বটে। এ বিশ্বজগতে একমাত্র মহান আল্লাহ্ বাস্তব অস্তিত্বের অধিকারী। তাঁর অস্তিত্বই অমর। বিশ্বের সবকিছু তাঁরই আশ্রয়ে অস্তিত্বের রং ধারণ করে। তাঁরই সত্তার জ্যোতিতে সবকিছু অস্তিত্বের জ্যোতি লাভ করে। মানুষ যখন এধরণের উপলব্ধির অধিকারী হয়, তখন তার অন্তরচক্ষু উন্মোচিত হয়। তখন সে তার ঐ অন্তরচক্ষু দিয়ে এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বগত সীমাবদ্ধতা অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তখন সে উপলব্ধি করে যে, সমগ্র বিশ্ব জগত এক অপরিসীম আয়ু, শক্তি ও জ্ঞানের অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল। এ জগতের প্রতিটি অস্তিত্বই অনন্ত

জগতের এক একটি জানালা স্বরূপ, যার ভিতর সেই অনন্ত অসীম জগতের দৃশ্যাবলীর কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের উপলব্ধি যখন এমনই এক স্তরে উন্নীত হবে, তখন সে তার মৌলিকত্ব ও সার্বভৌমত্বকে তার প্রকৃত সত্তার অধিকারীর কাছেই প্রত্যর্পণ করবে। তখন সে আপন হৃদয়কে সকল অস্তিত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে হৃদয়কে গেঁথে নেবে। একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া আর অন্য কোন শক্তির সামনে সে মাথা ঝোঁকাবে না। এ পর্যায়ে পৌঁছানোর পরই সে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বের অধীন হয়। তখন প্রতিটি অস্তিত্বকেই সে আল্লাহ্‌র মাধ্যমেই চেনে এবং সৎকাজ ও সচ্চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্‌র দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। আর এটাই হচ্ছে মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তর। ইমামগণ মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহও তত্ত্বাবধানেই মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের ঐ স্তরে উন্নীত হন। আর যে ব্যক্তি তার স্বীয় প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই পর্যায়ে উন্নীত হন, তিনিই ইমামের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে বিবেচিত হন। এটাই তার সাথে ইমামের পদমর্যাদাগত পার্থক্য। তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র পরিচিতি এবং ইমাম পরিচিতির বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। একইভাবে আল্লাহ্‌ পরিচিতি ও আত্মপরিচিতির বিষয়ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। কেননা, যে তার আপন সত্তাকে চিনতে সক্ষম হল, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তিই সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র সত্তাকেও অনুধাবন করতে সক্ষম হল।